# কবি

শায়িরু রাসূলিল্লাহ খ্যাত সাহাবি

আব্দুল্লাহ ইবনে রাওয়াহা ﵁-এর জীবনোপন্যাসিকা

বাপ্পা আজিজুল

গার্ডিয়ান
পাবলিকেশনস

# প্রকাশকের কথা

সাহিত্য দুনিয়া বহু ধারার সমন্বয়েই আলো বিলিয়ে যাচ্ছে পাঠক চোখে। গার্ডিয়ান সময়ের সাথে সাহিত্যের প্রতিটি ধারাতেই উঁকি মারার চেষ্টা করছে, পরখ করে দেখতে চাইছে কোন ধারার স্রোত কতটা শক্তিশালী।

বাপ্পা আজিজুল-এর কলমে গার্ডিয়ানের পাঠকবৃন্দ নতুন এক ধারার সাথে পরিচিত হতে যাচ্ছেন; যার নাম—বায়োনভেলা। বাংলা সাহিত্যে 'বায়োনভেলা বা জীবনোপন্যাসিকা'র ধারণা প্রায় নতুন বলা চলে। শব্দটি ইংরেজি Bio (জীবন) ও Novel (ক্ষুদ্রার্থে Novella) শব্দ থেকে আগত। সমকালীন বা ঐতিহাসিক কোনো বিখ্যাত ব্যক্তির জীবন ও কর্ম নিয়ে আলেখ্য উপন্যাসই বায়োনভেলা।

পেশায় চিকিৎসক লেখক বাপ্পা আজিজুল আসহাবে রাসূলদের নিয়ে সিরিয়াল বায়োনভেলা লিখছেন; নিঃসন্দেহে এ এক তৃপ্তির খবর। ইসলামি সাহিত্যিকরা এমন সাহিত্যকর্মের ব্যাপারে সচরাচর আগ্রহী নন; তরুণ এই লেখক এই ধারাকে ইসলামি দৃষ্টিকোণ থেকে গতিশীল করার একটা প্রচেষ্টা শুরু করেছেন। এটা বড়োই আশা জাগানিয়া ব্যাপার!

প্রখ্যাত সাহাবি আবদুল্লাহ ইবনে রাওয়াহা ﷺ-কে কেন্দ্র করে এই ভিন্নমাত্রার সাহিত্যরস আস্বাদন করে আমাদের পাঠকবৃন্দ পরিতৃপ্ত হবেন বলে আশা রাখছি। গ্রন্থটির নির্মাণ প্রক্রিয়ার সাথে সম্পর্কিত সকলের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি।

নতুন সাহিত্য পাটাতন নির্মাণে সম্মানিত পাঠকদের পাশে চাই।

নূর মোহাম্মাদ আবু তাহের
বাংলাবাজার, ঢাকা

# লেখককথন

‘কবি’ একটি জীবনোপন্যাস (বায়োনভেলা)। শিরোনাম শুনে যা ভাববেন—‘কবি’ নামে তো তারাশংকর ও হুমায়ূন আহমেদের উপন্যাস আছে? হ্যাঁ, বিলকুল সহিহ ভেবেছেন। তবে ‘কবি’ নামে কোনো বায়োনভেলা নেই। রাসুলুল্লাহ ﷺ-এর সাহাবি কবি আবদুল্লাহ ইবনে রাওয়াহার জীবনী নিয়ে লেখা উপন্যাস এটি। সাহাবিদের জীবন নিয়ে উপন্যাসের কাজ বাংলা সাহিত্যে হাতেগোনা। ইবনে রাওয়াহাকে নিয়ে উপন্যাস দূর কী বাত! এখনও মৌলিক কোনো বই রচিত হয়নি। সাহাবিদের জীবন সিরাতের অবিচ্ছেদ্য অংশ, তাই এখানে কল্পনার মিশ্রণ দুষণীয়। নিরেট কুরআন, হাদিস ও নির্ভেজাল ইতিহাসের বস্তুনিষ্ঠ বয়ান এখানে প্রাধান্য পেয়েছে। জীবনীগ্রন্থের টাইমলাইন, রেফারেন্স ও গদবাঁধা বর্ণনাকে উপেক্ষা করে উপন্যাসের ছাঁচে সরল উপস্থাপন করা হয়েছে।

আবদুল্লাহ ইবনে রাওয়াহা رضي الله عنه একজন খাজরাজী আনসার ছিলেন। যিনি একাধারে কবি, বাগ্মী, যোদ্ধা এবং সমরবিদ। ‘কবি’ জীবনোপন্যাসে তাঁর জাহেলি জীবন, ইসলাম গ্রহণ, বিভিন্ন যুদ্ধে অংশগ্রহণ, কবিতা ও কাব্যচর্চা নিয়ে আলেখ্য তৈরি করা হয়েছে। বিশেষ করে তিনি ছিলেন মুতা যুদ্ধের অন্যতম সেনাপতি। তিনি বীরত্বের সাথে যুদ্ধ ও নেতৃত্ব দিয়ে শাহাদাতবরণ করেন।

ইসলামে কবি ও কবিতার অবস্থান নিয়ে জনসাধারণের মধ্যে বিভ্রান্তি আছে। যেমন সূরা শুআরার ২২৬ নং আয়াত উল্লেখ করে অনেকেই বলেন কবিরা উদভ্রান্ত। এই ভুল ধারণার পরিবর্তন এবং রাসুলুল্লাহ ﷺ ও সাহাবিদের কাব্যানুরাগ, অনুশীলন ও কাব্যযুদ্ধ নিয়ে পাঠক এখানে পরিষ্কার ধারণা পাবেন। এছাড়া জাহেলি যুগের মুয়াল্লাকের সর্বশ্রেষ্ঠ সাতটি কবিতার চুম্বক অংশ আস্বাদন করতে পারবেন। পুরো উপন্যাসের পরতে পরতে সঙ্গত কারণেই প্রচুর কবিতা ও কবিতাংশ স্থান পেয়েছে। ইবনে রাওয়াহার কবিতার পাশাপাশি হাসসান ইবনে সাবিত, কাব ইবনে মালিক ও অন্যান্য কবিদের কবিতাও প্রাসঙ্গিকভাবে যুক্ত করা হয়েছে। তাই ‘কবি’ গ্রন্থটি হবে ‘একের ভেতর তিন’। জীবনী, উপন্যাস ও কাব্যগ্রন্থ।

বইটি প্রকাশ করার জন্য গার্ডিয়ান পাবলিকেশন্স পরিবারের কাছে কৃতজ্ঞ। তাদের উত্তরোত্তর সাফল্য কামনা করছি।

বাপ্পা আজিজুল
বগুড়া
২১ জানুয়ারি, ২০২১

# কবিতা যুদ্ধের প্রেরণা

আহজাবের যুদ্ধ বিজয়ের পর নবগঠিত মদিনা রাষ্ট্রটি অনেকটাই সুসংহত। হুদাইবিয়ার সন্ধি আপাতদৃষ্টিতে মুসলিমদের বিপক্ষে গেলেও আখেরে তা কল্যাণের সুবাতাস বয়ে নিয়ে আসতে শুরু করেছে। খাদের কিনারে পৌঁছে গেছে মক্কার কুরাইশ নেতারা। ওইদিকে ইহুদিরা খায়বারে কুপোকাত হয়েছে। আহজাবের যুদ্ধের ত্রিভুজ শক্তির প্রধান দুই বাহুকে নাস্তানাবুদ করে রাসূলুল্লাহ ﷺ মনোযোগ দিয়েছেন বেদুইনদের প্রতি। উমরাতুল কিসাস পালন করে এসে প্রায় চার মাস তিনি মদিনাতেই কাটালেন। অবশ্য ছোটো ছোটো কিছু অভিযান তখনও চালু ছিল। বনু সুলাইম, বনু কুজায়া ও বনু হাওয়াজিনের বিরুদ্ধে চালিত সেসব অভিযানে বড়ো সাফল্য না এলেও সতর্ক হয়ে যায় গোত্রগুলো।

আগস্ট, ৬২৯ ঈসায়ি। হারিস ইবনে উমাইর رضي الله عنه-এর ডাক পড়ে নবির পরামর্শ বৈঠকে। তাঁকে একটি দাওয়াতি চিঠি ধরিয়ে দেওয়া হয়। গন্তব্য বসরা। সায়্যিদুল মুরসালিনের পক্ষ থেকে দায়িত্ব পেয়ে আনন্দে ও আহ্লাদের আতিশয্যে আটখানা হয়ে অশ্ব ছোটাতে থাকেন হারিস رضي الله عنه। এটি নিছক দূতিয়ালি নয়; বরং রাউফুর রাহিমের আস্থার প্রতি সুবিচার করা। তাঁর সন্তুষ্টির জন্য ব্যাকুল হওয়া। ভালোবাসা অর্জনে আকুল হওয়া। স্বল্প সময়ে বসরার গভর্নরের কাছে পত্র হস্তান্তর করার মন্ত্র নিয়ে হন্তদন্ত হয়ে ছুটতে থাকেন তিনি। তা ছাড়া শিক্ষক নবির সাহচর্য থেকে মাহরুম থাকতে কে চায়!

জর্দানের বালকা এলাকায় পৌঁছতেই সিজারের টহলরত সেনারা তাঁকে আটক করে জিজ্ঞাসাবাদ শুরু করে। তুলে দেয় সিজারের ঘনিষ্ঠজন গভর্নর শুরাহবিল ইবনে আমর গাসসানির হাতে। হারিস رضي الله عنه-এর মুসলিম পরিচয়ে হিংসার পারদে তরতর করে জ্বলে ওঠে সে। বিনা উসকানিতে হত্যা করা হয় এই মুসলিম দূতকে। চিরায়ত নিয়মও বলে, দূত হত্যা যুদ্ধ ঘোষণার শামিল কিংবা তার চেয়েও গুরুতর। সে বার্তাই কি দিলো রোম সাম্রাজ্যের অন্যতম অভিজ্ঞ এ গভর্নর?

খবর এলো রাসূলে আকরামের কাছে। তিনি মর্মাহত হলেন। প্রতিপক্ষের বার্তা বুঝতে বেগ পেতে হলো না। ঘোষণা এলো যুদ্ধের। দূত হত্যার প্রতিশোধের। সৈন্যরা প্রস্তুতি শুরু করল। ৩ হাজার জানবাজ পালোয়ান তৈরি হয়ে গেল। সংখ্যা বিচারে এযাবৎকালের সর্বোচ্চই বলা যায়। যদিও ঘরে মোকাবিলার কারণে আহজাবের যুদ্ধ এখানে ধর্তব্য নয়। মসজিদে নববির মজলিসে বসে নবিজি ঘোষণা দিলেন—

> ‘জায়েদ ইবনে হারিসা সেনা অভিযানের সেনাপতি হিসেবে দায়িত্ব পালন করবে। জায়েদ নিহত কিংবা আহত হলে নেতৃত্ব দেবে জাফর ইবনে আবু তালিব, জাফর শহিদ কিংবা আহত হলে সিপাহসালারের দায়িত্ব নেবে আবদুল্লাহ ইবনে রাওয়াহা। ইবনে রাওয়াহা যদি শাহাদাতবরণ করে, তখন তোমরা যাকে উপযুক্ত মনে করবে, সেনাধ্যক্ষ নিযুক্ত করে নেবে।’

জাফর ﷺ জানালেন—‘ও আল্লাহর নবি! আমি এত ভীরু নই যে আপনি আমার আগে জায়েদকে সেনাপতি নিযুক্ত করবেন। আপনি যদি জায়েদকে আমার পূর্বসূরি হিসেবে নিয়োগ দেন, তবে আমি যুদ্ধে যাব না।’

‘যুদ্ধে যাও। তোমার জন্য কোনটি কল্যাণকর তুমি জানো না।’ শীতল গলায় জবাব দিলেন কোমলভাষী নবি।

ইহুদি সম্প্রদায়ের নুমান ইবনে ফিনহাস সেখানে উপস্থিত ছিল। সে উঠে বলল—

> ‘ও আবুল কাসেম! তুমি যদি সত্য নবি হও, তবে যাদের নাম উল্লেখ করেছ; কম হোক বা বেশি হোক, তাঁরা সবাই শাহাদাতের সুধা পান করবে। অতীতে বনি ইসরাইলের নবিরাও জাতির সামনে যাদের নাম পেশ করে শহিদ হওয়ার ঘোষণা দিত, তা একশোজন হলেও তাঁরা অবশ্যই শাহাদাতবরণ করত।’

জায়েদ বিন হারিসা رضي الله عنه নুমানের কথায় চটে গেলেন। মুখের ওপরেই জানিয়ে দিলেন—‘আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি, তিনি অবশ্যই সত্য নবি ও পুণ্যবান।’

নুমান উত্তরে বলল—‘তাহলে জায়েদ! তুমি শুনে রাখো, মুহাম্মাদ যদি সত্যি তা-ই হয়ে থাকে, তবে তুমি আর কোনোদিন ফিরে আসবে না।’

সভা ভেঙে গেল। প্রত্যেকে তাঁদের পরিবারে ফিরে গেল। স্বল্প সময়ে বিদায় নিয়ে তল্পিতল্পাসহ মসজিদে নববির উঠোনে জড়ো হলো। পয়গম্বর জায়েদ ইবনে হারিসা رضي الله عنه-এর হাতে সাদা পতাকা তুলে দিলেন। জায়েদ رضي الله عنه সে ঝান্ডা সমুন্নত রাখার শপথ করলেন। আল্লাহর রাসূল ﷺ সৈন্যদের যুদ্ধের শৃঙ্খলা, সৌন্দর্য ও সীমা স্মরণ করিয়ে দিলেন—

> ‘তোমরা হারিসের হত্যাকাণ্ডের স্থানে গিয়ে স্থানীয়দের ইসলামের দিকে আহ্বান করবে। যদি তারা ইসলাম গ্রহণ করে, তবে তো ভালো। তা না হলে আল্লাহর কাছে সাহায্য চাইবে এবং তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবে। আল্লাহর নাম নিয়ে আল্লাহর পথে আল্লাহকে অস্বীকারকারীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবে। বিশ্বাসঘাতকতা করবে না। খেয়ানত করবে না। কোনো নারী, শিশু, বৃদ্ধ কিংবা গির্জায় অবস্থান নেওয়া সন্ন্যাসীদের হত্যা করবে না। খেজুর ও শস্যখেত নষ্ট করবে না। কোনো অট্টালিকা বা স্থাপনা ধ্বংস করবে না।’

মদিনার আবালবৃদ্ধবনিতা মুসলিম বাহিনীকে বিদায় জানাতে এবং একনজর দেখতে হাজির হলো। মুসলিম সৈন্যদল এই প্রথম মদিনার বাইরে এত দূর অভিযানে যাচ্ছে। তা ছাড়া অচেনা শত্রু। এই প্রথম খ্রিষ্টান পরাশক্তির সাথে মোকাবিলা হবে। সবচেয়ে বেশি সৈন্যও এবার যুদ্ধে নাম লিখিয়েছে। মদিনার প্রতিটি পরিবার এ যুদ্ধে সম্পৃক্ত হয়েছে। যুক্ত হয়েছেন খালিদ ইবনে ওয়ালিদ, আমর ইবনুল আস, আবু হুরায়রা رضي الله عنهم-এর মতো নওমুসলিম। যোদ্ধাদের মধ্যে কাজ করছে শাহাদাতের আবেগ ও জজবা। হৃদয়ে আবে হায়াতের তৃষ্ণা। অন্যদিকে পরিজনেরা এসেছে উদ্বেগ ও উৎকণ্ঠা নিয়ে।

অন্যতম সেনানায়ক আবদুল্লাহ ইবনে রাওয়াহা رضي الله عنه খাজরাজ গোত্রের বনু হারিস উপগোত্রের একজন। তাঁর মনোনয়নে আনসাররা যারপরনাই খুশি। আনন্দের আবিরছটা তাঁদের চোখেমুখে, অঙ্গভঙ্গিতে। আবদুল্লাহ رضي الله عنه-এর প্রশংসা সবার মুখে মুখে। অথচ তিনি কাদছেন। জনতা তাঁকে জিজ্ঞেস করল—'আপনি কাঁদছেন কেন ইবনে রাওয়াহা?

---

# চতুর্দশী চাঁদ

নবুয়তের দশম বছর। বেদনার সেই বছরে তিন দিনের ব্যবধানে পিতৃব্য আবু তালিব ﵁ ও প্রিয়তমা স্ত্রী খাদিজা ﵂-এর বিয়োগে ব্যথাতুর হয়ে উঠেন প্রিয়নবি। এত দিনের নিশ্চিত সুরক্ষাবলয় নড়বড়ে হয়ে ওঠে। মাত্র মাস ছয়েক আগে সাড়ে তিন বছরের অন্তরিন কাটিয়ে উঠেছিলেন তাঁরা। মক্কার কুরাইশ নেতারা তাই আবারও নড়েচড়ে ওঠে। মুহাম্মাদ ﷺ-কে হত্যার ঘৃণ্য ষড়যন্ত্রে যুক্ত হতে থাকে তারা।

নিজের ও মুসলিমদের নিরাপত্তা বিধান ও ইসলামের আহ্বান পৌঁছিয়ে দিতে নবিজি ﷺ পা বাড়ান তায়েফের পথে। হয়তো তাদের শুভবুদ্ধির উদয় হবে। হিদায়াতের নবিকে আশ্রয় দেবে! কিন্তু হতভাগা তায়েফবাসী। তারা শেষনবিকে গ্রহণ তো দূরের কথা; বর্ণনাতীত নির্যাতন করে তাড়িয়ে দেয়। লেলিয়ে দেয় বখাটে বালকদের। পাথরের আঘাতে তামাম শরীর রক্তাক্ত হয়ে যায়। জুতোর মধ্যে রক্ত জমাট বেঁধে পা আটকে যায়। নিদারুণ দুর্দশার এ সময়ে জায়েদ ইবনে হারিসা ﵁ তাঁকে আগলে রাখার চেষ্টা করেন। তাঁরা একটি আঙুর বাগানে আশ্রয় নিলে দুর্বৃত্তরা তাঁদের ছেড়ে যায়। মজলুম নবির জীবনে সবচেয়ে ভয়াবহ বিপদের ছিল এ দিনটি; এমনকী উহুদের চেয়েও। না, নিজের কষ্টে তিনি তায়েফবাসীর জন্য বদদুআ করেননি; বরং তারা ঈমান না আনায় ব্যথিত হয়েছেন। বাগানে বসে বিখ্যাত সেই দুআ করেন—যা দুর্বলের দুআ নামে পরিচিত।

‘হে আল্লাহ! আমি তোমার কাছে আমার দুর্বলতা, অসহায়ত্ব, বিচক্ষণতার অভাব এবং মানুষের কাছে আমার মূল্যহীনতার অভিযোগ করছি। তুমি দয়ালু দাতা, দুর্বল ও উপেক্ষিতদের প্রভু! তুমি আমারও প্রভু। তুমি আমাকে কার রহম ও করুণার ওপর ন্যস্ত করছ? আমার সাথে যে নিষ্ঠুর আচরণ করে সেই অনাত্মীয়ের ওপর? নাকি সেই শত্রুর ওপর, যে আমার ওপর প্রভাবশালী ও পরাক্রান্ত হয়ে উঠেছে? যদি তুমি আমার ওপর অসন্তুষ্ট না হও, আমার কোনো আফসোস নেই। দুঃখ নেই। তোমার ক্ষমাশীলতা আমার জন্য প্রশস্ত ও প্রসারিত করো। আমি তোমার সেই জ্যোতির আশ্রয় চাই, যার আবির্ভাবে সমস্ত অন্ধকার আলোতে উদ্ভাসিত হয় এবং যার সাহায্যে দুনিয়া ও পরকালে সকল সমস্যার সুরাহা হয়। তোমার সকল ভর্ৎসনা আমি মাথা পেতে নিতে প্রস্তুত। সকল ক্ষমতা ও শক্তি শুধু তোমারই। তোমার শক্তি ছাড়া কারও কোনো শক্তি নেই।’

ফিরতি পথে পছন্দের গারে সুর পর্বতের হেরা গুহাতে আশ্রয় নেন নবি আল-আমিন। মক্কায় ফেরা নিরাপদ নয়। তাই নিরাপত্তার আশ্রয় প্রার্থনা করে কয়েকজনের কাছে লোক মারফত বার্তা পাঠালেন। আখনাস ইবনে শুরাইক, সুহাইল ইবনে আমর অপারগতা প্রকাশ করল। কিন্তু অস্ত্র সজ্জিত হয়ে

নিজের গোত্রের সবাইকে সমবেত করে নিরাপত্তা দানে রাজি হয়ে গেলেন মুতইম ইবনে আদি। তাঁর আশ্রয়ের আশ্বাস পেয়ে পয়গম্বর জায়েদ ﵁-কে নিয়ে মক্কায় এলেন। মুতইমের পরিবার ও গোত্রের লোকেরা নিরাপত্তা বেষ্টনী তৈরি করে রাখল। আল্লাহর বন্ধু আল্লাহর ঘর তাওয়াফ করে দুই রাকাত নামাজ পড়ে ঘরে ফিরলেন। মুতইমের এই সহযোগিতার জন্য মজলুম নবি সারা জীবন কৃতজ্ঞ ছিলেন। বদরের পরে বলেছিলেন—'আজ যদি মুতইম ইবনে আদি বেঁচে থাকতেন, আর এই যুদ্ধবন্দিদের জন্য সুপারিশ করতেন, আমি বিনা শর্তে তাদের মুক্ত করে দিতাম।'

পরের বছর হজের মৌসুমে সুবর্ণ সুযোগটি চলে আসে। আল-হাদি প্রতিটি গোত্রের তাঁবুতে গিয়ে ইসলামের আহ্বান পৌঁছে দেন। এরই মধ্যে মদিনার আওস ও খাজরাজ গোত্রের ছয়জন সত্যান্বেষী আল্লাহর রাসূলের খোঁজ পেয়ে তাঁর সাথে নিভৃতে সাক্ষাৎ করেন। সত্যের মর্মবাণী উপলব্ধি করে ইসলামের ছায়াতলে শামিল হন। পুণ্যবান ছয়জন একত্ববাদের পয়গাম নিয়ে ফিরে যান ইয়াসরিবে। ইয়াসরিবে ইসলাম অনেক আকাঙ্ক্ষিত ছিল। কেননা, ইহুদিরা সব সময় আওস ও খাজরাজদের হুমকি দিত, 'শিগগির এক নতুন নবির আবির্ভাব হবে। আমরা আগেভাগেই তাঁর আনুগত্য করে তাঁর সহযোগিতায় তোমাদের পাইকারি হারে নিধন করব।' তাই নতুন নবির আবির্ভাবের খবর শুনে ইয়াসরিবের মানুষেরা তাঁর জন্য উন্মুখ হয়ে ছিল। ছয়জনের আহ্বানে নতুন এ ধর্মের বিস্তারে তাই বেগ পেতে হলো না। তখনও নিজেদের অহমবোধ ও পূর্বপুরুষের প্যাগান সংস্কৃতি ব্যতীত ইসলাম গ্রহণে অন্যকিছু তাদের অন্তরায় ছিল না।

পরের বছর হজে পুরোনো পাঁচজনসহ মোট তেরোজন আকাবার গিরিখাদে সাইয়্যিদুল আম্বিয়ার সাথে সাক্ষাৎ করেন। এক বছরের তৎপরতার সালতামামি দেন। ইসলামের নৈতিক ও সামাজিক শিক্ষার বিষয়ে শপথ করে ফিরে যান। সাথে নিয়ে যান রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর প্রিয়ভাজন মুসআব ইবনে উমাইর ﵁-কে। ইবনে উমাইর ﵁ সেখানে শিক্ষক হিসেবে আবির্ভূত হন। নামাজের ইমামতি করেন। ঘরে ঘরে ইসলামের সুমহান আদর্শকে সমুন্নত করার মিশন জারি রাখেন। ধীরে ধীরে বিলাল ﵁সহ অন্যরাও এসে তাতে যোগ দেন।

আবদুল্লাহ ইবনে রাওয়াহা ﵁ ত্রিশ বছরের টগবগে যুবক। তাগড়া জোয়ান। ইয়াসরিবে ইহুদি ছাড়া অন্যদের মধ্যে হাতেগোনা যে কয়েকজন অক্ষরজ্ঞানসম্পন্ন, তাদের নেতৃস্থানীয়। একজন দাপুটে বক্তা ও প্রতিভাবান কবি। আর দশজন কবির মতো তিনি ভবঘুরে নন এবং এতটুকুতেই ক্ষান্ত নন; তিনি একজন যোদ্ধা ও সমরবিদ। খাজরাজিদের অন্যতম গৌরব। আল্লাহ তাঁকে রহম করলেন। তিনি মুসআব ইবনে উমাইর ﵁-এর হাতে ইসলামের আবে শাবাব পান করলেন। বছর ঘুরে আবার এলো জিলহজ। তার আগেই মুসআব ﵁ ফিরে যান মক্কায়। নবিজির কাছে মদিনার রিপোর্ট ও সম্ভাবনার কথা তুলে ধরেন।

৭৫ জন মুসলিম এবার মদিনা থেকে হজে আসেন। কবি কাব ইবনে মালিক ও আবদুল্লাহ ইবনে রাওয়াহা ﵃ তাঁদের অন্যতম। রাতে অন্য সাথিরা ঘুমিয়ে গেলে চড়ুই পাখির মতো নৈঃশব্দ্যে বেরিয়ে পড়েন এই তীর্থযাত্রীরা। মিলিত হন গোপনে পূর্বের সেই আকাবার গিরিবর্তে। দ্বিতীয়বারের

মতো শপথ নেন তাঁরা। রাসূলের পক্ষে প্রথমে তাঁর চাচা আব্বাস ﵁ বক্তব্য দিয়ে চলমান সংকট এবং তাঁদের প্রতি রাজনৈতিক প্রত্যাশার কথা সুস্পষ্ট ও জোড়ালোভাবে ব্যক্ত করেন। কাব ﵁ বললেন—

> ‘ হে আল্লাহর রাসূল! আমরা আব্বাসের কথা শুনলাম। এবার আপনি বলুন। আপনি নিজে ও আপনার প্রতিপালকের পক্ষ থেকে কোনো অঙ্গীকার নিতে চাইলে নিন।’

---

# রাসূলুল্লাহর কবি

কোনো কোনো কথা তো জাদু। পঞ্চম ও ষষ্ঠ শতাব্দীতে আরবদের ভাষা, সাহিত্য, বাগ্মিতা তেমনই উচ্চ শিখরে পৌঁছে যায়। সেমিটিক ভাষাসমূহের মধ্যে প্রধান ও জীবন্ত ভাষা হিসেবে আরবি অপ্রতিদ্বন্দ্বীরূপে আবির্ভূত হয়। পৃথিবীর আর কোনো ভাষা তার ব্যবহারকারীর মধ্যে এমন স্বজাত্যবোধ ও প্রভাব বিস্তার করতে পেরেছে কি না সন্দেহ। কবিতা হলো আরবীয়দের গণনিবন্ধ। কবিতা তাদের যাপিত জীবনের নিখুঁত ভাষ্য। যুদ্ধ, নারী ও মদ তাদের জীবনের অবিচ্ছেদ্য অংশ। তাই তাদের কাসিদাতেও তা হয়ে উঠেছে গুরুত্বপূর্ণ প্রসঙ্গ ও অনুষঙ্গ। প্রকাশ পেয়েছে তাদের অসাধারণ মানবিক গুণাবলি, গোত্রীয় মর্যাদা। বোহেমিয়ান বেদুইন জীবন। মরুর দুর্বিনীত প্রকৃতি কিংবা মুসাফিরের দুর্দান্ত অভিজ্ঞতা। প্রাক-ইসলামি যুগে তাই কবি বা শায়িরের সামাজিক মর্যাদা একজন বীরের চেয়ে কোনো অংশে কম ছিল না।

আর কেউ যদি একই সঙ্গে কবি ও যোদ্ধা হয়, তবে তো সোনায় সোহাগা। কবিতাগুলো মুখে মুখেই রচিত হতো। আবার মানুষের মুখে মুখেই তা বহমানকাল ধরে সংরক্ষিত হতো। প্রাচীন আরব্য গীতিকবিতার মধ্যে মুয়াল্লাকের খ্যাতি দুনিয়াজোড়া। সাতটি মুয়াল্লাক কাবার দেয়ালে স্বর্ণাক্ষরে লিখে ঝোলানো ছিল। এগুলো ছিল শতাব্দীর শ্রেষ্ঠ কবিতা। আরবীয় সাহিত্যের উৎকর্ষের নিদর্শন। কবিদের অমরত্বের দলিল। প্রতি বছর হজের মৌসুমে আরবের বিভিন্ন গোত্রের মানুষের ব্যাপক জনসমাগম হয়। সেখানে কাবাকে ঘিরে যেমন জটলা তৈরি হয়, তেমনি কবিকে ঘিরেও। কবিরা তাদের স্বরচিত নতুন নতুন কবিতা আবৃত্তি করে পরিবেশকে মোহনীয় করে তোলে।

হজ শেষেই এক মাসের জন্য জমে উঠে উকাজের মেলা। তাইফ ও নাখলার মধ্যবর্তী স্থানে অবস্থিত এ মেলায় পসরা সাজিয়ে বসে পুরো দুনিয়ার দ্রব্যসম্ভার। কি মিশরের গালিচা, ইয়েমেনের রেশমি বস্ত্র, হিন্দুস্থানের মসলাপাতি, সিরিয়ার অস্ত্রপাতি—সবই মেলে এ মেলায়। মেলার আকর্ষণের কেন্দ্রবিন্দু ছিল সাহিত্য সম্মেলন—যেখানে হতো কাব্যযুদ্ধ। প্রত্যেক কবি তাদের অনুপম কবিতাশৈলী, অভিনব আলেখ্য, অভূতপূর্ব উপমা ও বিস্ময়কর বাক্‌শৈলী দিয়ে দর্শক উন্মাদনা তৈরি করত, প্রতিপক্ষকে ধসিয়ে দিত এবং বিচারকের আনুকূল্য লাভের প্রাণান্তকর প্রয়াস চালাত। চূড়ান্ত বিজয়ীর হাতে জুটত বর্ষসেরা কবির খেতাব। সাথে নানাবিধ উপঢৌকন ও নগদ অর্থমূল্য। কোনোক্রমে যদি সে কবিতা হয়ে উঠে সহস্রাব্দের মাস্টারপিস, তাহলে তো তার অমরত্ব পাকাপোক্ত। মুয়াল্লাকে উঠে যেত তার নাম ও কবিতা। এ ছাড়া কবিতা পাঠ হতো রাজদরবারে। সেখানেও রাজার এনাম মিলত। কবিতা আবৃত্তি হতো যুদ্ধের উসকানি ও প্রেরণায়। এক গোত্র অন্য গোত্রের নিন্দা করত।

‘শারিব’ ও ‘উরুজ’ নদীর মোহনায় উকাজের মেলায় সর্বপ্রথম যিনি সবার নজর কাড়েন, তিনি হলেন কিন্দা গোত্রের মুকুটহীন সম্রাট ইমরুল কায়েস। মুয়াল্লাকের প্রথম কবিতা তাঁর। তাঁকে আরবি সাহিত্যের জাহেলি যুগের সর্বশ্রেষ্ঠ ও অগ্রসর কবিও বলা হয়। তাঁর একটি পঙ্‌ক্তি এমন—

‘দাঁড়াও, একটু কেঁদে নিই প্রিয়তমা ও তার বাসগৃহের বিরহে।
যে বসত বালির টিলার চূড়ায় দাখুল ও হাওমাল,
তুজিহ ও মাকরাত নামক স্থানের মাঝে।
উত্তর ও দক্ষিণের বায়ুপ্রবাহেও যার চিহ্ন যায়নি আজও মুছে।’

মুয়াল্লাকের দ্বিতীয় কবি নাবিগা। তাঁর কবিতার অংশবিশেষ—

‘উলইয়া ও সানাদে অবস্থিত হে প্রিয়ার গৃহ!
সে হয়েছে অতীত, দীর্ঘ বর্ণনাতীত তার বিরহ।’

তৃতীয় মুয়াল্লাকের রচয়িতা জুহাইর, যার প্রথম চরণ—

‘দাররাজ ও মুতাছাল্লামের কঠিন ভূখণ্ডে অবস্থিত

এই নীরব ধ্বংসস্তূপই কি আমার প্রিয়তমা উম্মে আওফার স্মৃতি?'

কবি তরফার কবিতা চতুর্থ মুয়াল্লাকে স্থান পায়। তিনি সেটিতে বলেছেন—

'ছাহমাদের পাথুরে অঞ্চলে আমার প্রিয়া খাওলার বাসগৃহের স্মৃতি
নারীদের হাতে আঁকা উলকির ন্যায় ঝলমলে লাগে।'

আনতারা ইবনে শাদ্দাদ পঞ্চম মুয়াল্লাকের কবি। তিনি রচনা করেছেন

'পূর্বের কবিরা রাখেনি কোনো অপূর্ণতা
যা পূরণের রয়েছে বাকি,
অনেক আন্দাজ-অনুমানের পর
প্রিয়ার গৃহের সন্ধান পেয়েছ তুমি।'

বনি তামিমের আলকামা ইবনে আবাদা মুয়াল্লাকের ষষ্ঠ কবিতায় শোনাচ্ছেন—

'তোমাকে নিয়ে আমার সৌন্দর্য পিয়াসি মন যখন উচ্ছ্বসিত হলো
তখন আমি যৌবন বিগত এবং বার্ধক্য এসে হানা দিলো।'

কবি লাবিদ ইবনে মালিক সপ্তম মুয়াল্লাকের রচয়িতা। তাঁর প্রথম পঙ্‌ক্তি

'মিনার যে গৃহে প্রিয়া আমার
কখনো স্বল্প, কখনো দীর্ঘ সময় করত অবস্থান,
তার চলে যাওয়ার পর সেসব হয়েছে বিরান।
বসতিশূন্য এখন মিনার গাওল ও রিজাম নামক স্থান।'

---